দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১৪৩

তারিখ 18 JUL 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

পথিকৃৎ বিজ্ঞানী : শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন

জন্ম : ৩০ জুলাই, ১৮৯৭মৃত্যু : ৯ অক্টোবর, ১৯৮১

একজন পরিপূর্ণ মানুষকে, মুক্তবুদ্ধি চেতনার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত একটি প্রতিভাকে নিজেদের কাছে পাওয়ার সৌভাগ্য কয়েক বছর আগেও আমাদের ছিল ; আজ নেই। দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী দিক হলো মানুষটি মূলতঃ ছিলেন একজন বিজ্ঞানী, গণিতবেত্তা। ১৯৮১ সালের ৯ই অক্টোবর কাজী মোতাহার হোসেনের তিরোধানে আমরা হঠাৎ হারিয়ে ফেললাম আমাদের কবি ও বৈজ্ঞানিককে। তিনি লিখেছেন, "এ দুয়ের সাধনা যেমন বিভিন্ন, দৃষ্টি ও সৃষ্টি তেমনি পৃথক।" কিন্তু তাঁর নিজের জীবন এ কথার প্রমাণ দেয় না। সেখানে আমরা দেখেছি একটি অখণ্ড প্রতিভাকে। বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্ম, দর্শন–সব কিছু থেকে জীবন-রসের সিঞ্চন করে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিলেন তিনি।

মোতাহার হোসেন নিজকে গড়ে তুলেছিলেন সাধারণের কাতার থেকে। স্কুলের শিক্ষক তাঁকে দেখেন 'গন্ড গ্রাম থেকে আসা ছেলেটি হিসেবে, যার শুধু ধুতি ছাড়া অন্য পোশাক নেই।' সেই যে প্রাইমারীতে মাসিক ২ টাকা করে বৃত্তি পেয়েছিলেন, তারপর থেকে পুরো ছাত্র জীবনে বৃত্তির টাকা ছিল তাঁর একটি প্রধান সম্বল। এম,এ, পড়ার সময়কার কথা লিখেছেন, "এর কিছু আগে থেকেই আমাকে বৃত্তির সব টাকা বাপ-মায়ের ভরণ-পোষণের জন্য বাড়িতে পাঠাতে হত, আর আমি প্রাইভেট টিউশনি করে বিশ-পঁচিশ টাকা যা পেতাম তাই দিয়েই নিজের খরচ চালাতাম।" শতাব্দীর শুরুর দিকে বনেদী কিন্তু দরিদ্র রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের যাবতীয় দুর্ভোগের মধ্যেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন মোতাহার হোসেন।

অথচ এর মধ্যেই দেখি মেধাবী ছাত্র হিসেবে এবং সাহিত্যে, বিজ্ঞানে সৃষ্টিশীল তরুণ হিসেবে তাঁর যোগ্য স্থানটি তৈরী হয়ে চলেছে। কাজী মোতাহার হোসেনের কর্মজীবনে প্রবেশ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি প্রায় একই সময়ের ঘটনা। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু, আর একই দিনে কাজী মোতাহার হোসেন এখানে পদার্থবিদ্যার প্রদর্শক-শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদলে আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তোলা হবে একে, এই আকাঙ্ক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টাকারদের। সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে প্রতিভার সমাগম হয়েছে এখানে। পদার্থবিদ্যায় সত্যেন্দ্র নাথ বসু, কৃষ্ণান, রসায়নে জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, ইতিহাসে রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গণিতে বিজয় রাঘবন, উদ্ভিদবিদ্যায় মহেশ্বরীর মতো কীর্তিমানদের নিয়ে এর বিদ্যৎমণ্ডলী।

নবীন হলেও কাজী মোতাহার হোসেন সেই আসরে দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জীবনসায়াহ্নে এসে সে কথা ভোলেননি সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৭৪ সালে লেখা এক পত্রে তিনি লিখেছেন, "মনে পড়ছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো, তখন আমরা কয়জন নবীন মিলে 'বারোজন' বলে একটি সভায় মিলিত হতাম। কাজী মোতাহার হোসেন তখন ছিলেন সভ্য সকলের থেকে ছোট।"

যেখানে সত্যেন বসু কর্ণধার সেখানে পদার্থবিদ্যায় এবং গণিতে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে পদে পদে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবেই তাঁর অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। তাঁর জীবনের মোড় সংখ্যাতত্ত্বের দিকে কিভাবে গেল সে সম্বন্ধে

দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 18 JUL 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কাজী মোতাহার হোসেন

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

তিনি লিখেছেন, : গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলেই আমাকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে গেলেন, আর (ডঃ প্রশান্তচন্দ্র) মহলানবিশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখ, এ আমার ছোট ভাইয়ের মতো। একে বছর খানেকের মধ্যে যতটা পার পরিসংখ্যান শিখিয়ে দাও। একে যোগ্য মনে করেছি বলেই তোমার হাওয়ালা রেখে যাচ্ছি।"

সেই যে সংখ্যাতত্ত্বের চর্চা শুরু করলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টির প্রারম্ভ ও বিকাশে অত্যন্ত যোগ্য নেতৃত্ব তিনি দিয়ে গিয়েছেন। সংখ্যাতত্ত্বে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর অভিসন্দর্ভটি ছিল 'পরীক্ষণের কাঠামো'–এই বিষয়ের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ রোনাল্ড ফিশার অভিসন্দর্ভের অন্যতম পরীক্ষক হিসেবে মন্তব্য করেছিলেন, "জনাব হোসেনের উদ্যোগী মননশীলতা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। নতুন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এগুলো প্রয়োগ করে তিনি এমন কিছু ফলাফল প্রমাণিত করেছেন যেগুলোর প্রমাণে অপারগ হয়ে এদ্দিন আমি শুধু আন্দাজই করতে পারছিলাম।" সংখ্যাতত্ত্বে মোতাহার হোসেনের একটি অবদান এর মৌলিকত্বের জন্য 'হোসাইনস চেইন রুল' নামে পরিচিত।

সেই অধ্যাপক তাঁর নিজের ভাষ্য মতে, ১৯৩৬-৩৭ সালের দিকেই 'সত্যেন বসুর সমর্থনে (আইনত তাঁর যোগসাজশে) বেআইনীভাবে' বাংলা ভাষায় পদার্থবিদ্যা বি, এ, এম, এ, ক্লাসে পড়াতে শুরু করেছিলেন। ষাটের দশকের ছাত্ররাও সংখ্যাতত্ত্বের ওপর সেই অধ্যাপক হোসেনের সাবলীল ভাষায় শিক্ষকতা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছে। তিনি তো শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ একজন প্রাবন্ধিকও। বিজ্ঞানের ওপর, সমাজ প্রগতির ওপর, মুক্তবুদ্ধির ওপর শাণিত যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তাঁর বিভিন্ন লেখার ছত্রে ছত্রে রয়েছে। 'শিখা' গোষ্ঠির মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন তিনি। গোষ্ঠীবদ্ধ সে আন্দোলন অল্পদিন চলেছে, কিন্তু মোতাহার হোসেন সেই শিখা বহন করেছেন সারাটা জীবন।

তাঁর সাহিত্যে, তাঁর জীবনে আর যে জিনিসটিকে বড় করে তুলেছিলেন তা হলো আনন্দ। লেখায় আনন্দ, ছন্দে আনন্দ, গানে আনন্দ, খেলাধুলায় আনন্দ, এমনকি যা সবার কাছে তত স্পষ্ট হতো না সেই গণিতেও আনন্দ। জীবনের একটি আক্ষেপের কথা তিনি বহুদিন আগে লিখেছিলেন, "মুসলমানের যে সুখ নেই তার একটা কারণ, আনন্দের উপকরণের অভাব। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকবে না, এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোন সংশ্রবেই থাকবে না।" যেন এর একটি বিহিত করার জন্যই নিজের জীবনকে উদাহরণ করে তুলে ধরেছিলেন তিনি। আনন্দের এই মিলের জন্যই তো ১৯২৮-এর টগবগে কবি নজরুল ঢাকায় এসে মাসের ওপর কাটিয়েছেন এই পদার্থবিদের বাসায় ; তাঁকে ডেকেছেন 'মোতিহার' এই নামে। বৃদ্ধ বয়সেও যে নানা আসরে দাবা খেলেছেন, সাইকেল চালিয়েছেন, কার্জন হলের গেট বন্ধ পেয়ে অবলীলাক্রমে গেট টপকিয়ে গেছেন সেও বয়সের ভেতর আনন্দ ছিল বলেইতো।

অনেক দিকে বিস্তৃত হয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই হালকাভাবে নেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডীন, পরিসংখ্যান বিভাগের ও পরে পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা-কর্ণধার হিসেবে, শেষ অবধি জাতীয় অধ্যাপকরূপে শিক্ষকতা, গবেষণা ও সাংগঠনিক কাজে নিজেকে নিষ্ঠা সহকারে নিয়োজিত করেছিলেন। সাহিত্য চর্চায় বিরাম ছিল না, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পদচারণায়ও কখনো ছেদ পড়েনি। উচ্চমানের টেনিস খেলেছেন দীর্ঘদিন ধরে–হাইজাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ড ছিল। তবে ক্রীড়াক্ষেত্রে গুরু ছিলেন তিনি দাবার। ১৯২৯ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের একচ্ছত্র দাবা চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। সে আসরে সর্বভারতীয় শিরোপাও পেয়েছেন কয়েকবার। দেশের দাবা সংগঠনের মধ্যমণি ছিলেন জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত, নিয়াজ মোর্শেদের উত্থানও দেখে গিয়েছেন।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেই শেষ করি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ছাত্র থাকাকালীন সলিমুল্লাহ হলে আমাদের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মূল বক্তা কাজী সাহেব। যারা তাঁকে আনতে গেল, বাসায় পেল না। কারণ, তিনি ইতিমধ্যেই সেগুনবাগিচায় তাঁর বাসা থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে গেছেন। সেদিনের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কি প্রসঙ্গে গান ধরলেন তিনি গুনগুন করে। দীর্ঘ বক্তৃতায় অনেক বার অনেকগুলো গানের কলি আবেগ দিয়ে গাইলেন সত্তর বছর বয়সী অধ্যাপক। আমাদের সময়সূচী ওলট-পালট হয়ে গেল। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে চলেছিলাম এই ঋষিতুল্য বিজ্ঞানীকে–যিনি আপন আনন্দে তখন আপনি বিভোর।